কথামুখ

রৌদ্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

পিসিমা!

বুড়ি কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল। দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে . . .

'পথের পাঁচালী'-র পাঠক ওপরের এই অংশ খুব সহজেই চিনতে পারবেন। এই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করার একটাই কারণ। মৃত্যুর দিন-দুই আগেও প্রকৃত অর্থেই নিঃস্ব ইন্দির ঠাকরুণের সম্পত্তি বলতে খান-দুই ছেঁড়া কাশি, ময়লা গামছার সঙ্গে একখানি জরাজীর্ণ কাঁথাও ছিল। বাংলার গ্রামীন জীবনের এক অন্যতম সঙ্গী ছিল কাঁথা। বাংলার বিভিন্ন লোককথা ও রূপকথায় বংশানুক্রমে কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রবাদপ্রতিম রাজা গোপীচন্দ্র যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন কাঁথা আর ঝোলা গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা মহমুদ সাইদুর রহমানের বর্ণনা থেকে জানতে পারি—

নাপিত আনাইয়া রাজা মস্তক মোড়াইলা।
গলে খ্যাতা দিয়া মুখের ভূষণ চড়াইলা।

নাজি পীর, মনাই পীর, ভোলা পীর, প্রভৃতি মুসলমান সন্তদের কাঁথা ব্যবহারের কথাও মহম্মদ সাইদুর রহমান উল্লেখ করেছেন। বাউল গানেও কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়—

আসমান জোড়া ফকির রে ভাই
জামিন জোড়া কেথা
এসব ফকির মরলে পরে
এর কবর হবে কোথা রে?

নানা রূপকথায় ও লোককথায় নিত্য ব্যবহার্য সামান্য বস্তু বা বিশেষ ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন বস্তুরূপে কাঁথাকে দেখা যায়। 'বুদ্ধ ভুতুম' গল্পে আমরা কাঁথার এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই। সাহিত্যেও কাঁথার উল্লেখ আছে। কবি নজরুল ইসলামের কবিতায়—

ঊষাদিদির উঠার আগে উঠব পাহাড় চূড়ে
দেখবো নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে।

১৯২০ সালের প্রথম দিকে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ গরীব দুঃখী মানুষের সঙ্গে কাঁথার সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। *বৃহৎ বঙ্গে* (১৯৩৫) দীনেশচন্দ্র সেন কাঁথার শৈল্পিক মূল্যের কথা লিখেছেন। জসীমউদ্দিনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কবিতায় গ্রাম বাংলার মেয়েদের সঙ্গে কাঁথার এক গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন। জসীমউদ্দিনের এই কবিতা রচনার আগে

কাঁথা শিল্প বা নকশি কাঁথা লোকশিল্পের অন্যতম সুপরিচিত নিদর্শন। মুখ্যত গ্রামবাংলার মহিলারা এই শিল্পে নিরত থাকতেন কখনো আন্তরিক তাগিদে কখনো বা সাংসারিক কি ব্যবহারিক প্রয়োজনে। সামাজিক প্রয়োজনও থাকত কখনো-কখনো। শিল্পীর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের ছোঁয়ায় এই শিল্পকর্ম একই সঙ্গে ঘর ও বাহিরকে প্রকাশ করত।

একথা স্বীকার্য, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন প্রয়োজন ও উপকরণের সহজলভ্যতার সূতিকাগারেই লোকশিল্পের জন্ম। কোনো বিশেষ অঞ্চলের আবহাওয়া, তার ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য, জনরুচি এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার ওপর তার নান্দনিক ও ব্যবহারিক বিকাশ নির্ভরশীল। লোকশিল্পের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের গাঁটছড়াও এই শিল্পজাত সামগ্রীর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে। একথা কাঁথাশিল্প সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

সংসার করতে গিয়ে কোনো জিনিসের ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আমরা সহজে তা বর্জন করতে পারি না। এই তথাকথিত 'অনাবশ্যক' সামগ্রীগুলোই গ্রামবাংলার মহিলারা সযত্নে সংগ্রহ করে রাখতেন। যেমন, সুতির পুরোনো কি ছেঁড়া ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতি। অব্যবহার্য পুরোনো শাড়ি থেকে পাড় ছিঁড়ে নিয়ে রঙিন সুতো বের করে নিতেন।

তারপর ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে কয়েকটি ধুতি বা শাড়ি পর পর সাজিয়ে, পুরু করে নিয়ে সেই জমিনের ওপর ওই সুতো দিয়ে মনের মতো নকশা সেলাই করে অসামান্য সূচীশিল্পের নিদর্শন তৈরি করতেন।

কাঁথাশিল্প একান্তভাবেই নারীশিল্প। এই শিল্পীদের মধ্যে আবার নানা বয়সের বিধবাদের সংখ্যাধিক্য। সেকালে, কাঁথার প্রার্থিত আকৃতি অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ স্থির করে নিয়ে পুরোনো কাপড়ের তিন-চারটি স্তর তৈরি করে, চার ধার খেজুর কাঁটা দিয়ে আটকে নেওয়া হতো। এরপর হাত বুলিয়ে জমিনটা সমান বা মসৃণ করে নেওয়া হয় যাতে কাপড় কোথাও কুঁচকে না থাকে। পুরু কাপড়ের জমিনটিকে পা দিয়ে চেপে রেখে বড়ো বড়ো টাঁক (ফোঁড় বা সেলাই) দিয়ে আটকে নিয়ে খেজুর কাঁটা খুলে ফেলা হতো।

এবার নকশা আঁকার পালা। এই কাজে ব্যবহার করা হতো কাঠকয়লা অথবা কোনো গাছের রস থেকে তৈরি করা রং। অনেক সময় এ ভাবে নকশা না এঁকেও কেবলমাত্র মনের ভাবনা ও তার রূপায়ণের র্নিভুল হিসেব মাথায় রেখে দক্ষ শিল্পীরা সুচ সুতো দিয়ে অবলীলায় জমিনের বুকে চিত্রবিচিত্র নকশা ফুটিয়ে তুলতেন।

ব্যতিক্রমী নকশার কথা বাদ দিলে বহুল প্রচলিত নকশা বলতে, মাঝখানে পদ্ম, চক্র বা যে কোনো আলপনা, তার চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন নকশা, চারধারে পাড়ের নকশা, চার কোণায়